# নীলাঞ্জনের খাতা: অস্তিত্ববাদের জানালা থেকে একটি দৃষ্টিপাত

মুহম্মদ মুহসিন[১]

স

(উত্তরাধুনিক ধারণার দ্বারা আলোকিত ও প্রাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারাটি কলাকৌশল এবং তত্ত্ব-তাত্ত্বিকতার সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে। এই পুষ্টি যাঁরা বিধান করেছেন তাঁরা ছিলেন একাধারে ইউরোপীয় সাহিত্যে-দর্শনে সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালী মননে সমৃদ্ধ অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এমন এক পণ্ডিত ও সৃষ্টি প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গৌরবকাল *কল্লোল* যুগের দিকপাল কবি ও ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তিকে বিবেচনায় রেখে এমন ভাবনা খুব সহজ ও স্বাভাবিক যে তাঁর হাত ধরে বাংলা উপন্যাসে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয় উপন্যাসের অনেক কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক অনুধ্যান। এই ভাবনার আলোকে তাঁর অন্যতম সফল উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা* 'র প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি অস্তিত্ববাদী সংকটের চিত্র খুব অনায়াসে চোখে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই বিশ্বাস কতটা প্রতিষ্ঠাযোগ্য তা খতিয়ে দেখা।)

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা* নীলাঞ্জন দে নামক এক ব্যক্তির একটি ব্যক্তি সম্পর্ক বিষয়ক সঙ্কটের কাহিনী। সঙ্কটটি নীলাঞ্জনের। তবে এ সঙ্কটের উদ্ভব ও বিস্তারের উৎসভূমে দাঁড়িয়ে আছে দুটি নারী চরিত্র। দুয়ের মধ্যে মুখ্য জন তাপসী দত্ত, ডাকনাম তপু। গৌণ জন ঊর্মিলা মজুমদার, ডাকনাম মিলি। হয়তো তিনি খানিকটা গৌণ বলেই শুধু ডাকনাম মিলি দ্বারাই সারা উপন্যাস জুড়ে পরিচিত। অন্যান্য চরিত্র একদমই হাতে গোণা। মূল কাহিনী এই তিন জনের মধ্যেই আবর্তিত। নীলাঞ্জনের সাথে নির্ঝঞ্ঝাট এক পরিণয়মুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে মিলির সাথে। সে এমন এক সম্পর্ক যে নীলাঞ্জন উহাকে প্রেম বলে হয়তো কখনো ভাবেন নি। যদিও সে সম্পর্কের মধুর প্রবাহকে তিনি পরিণয়ের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে উন্মুখ বলে প্রতীয়মান হয়েছে অনেক বিশেষ মুহূর্তেই। কিন্তু সেই পরিণয়মুখী সম্পর্কের নির্ঝঞ্ঝাট পথ ঘিরে সহসা এক সঙ্কট ঘনীভুত হয়ে ওঠে যখন তিনি অনুভব করেন যে তাপসী নামের মেয়েটির সাথে তাঁর সহমর্মিমতার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার নাম প্রেম। প্রেমের এই সচেতন অনুভূতিই মূলত নীলাঞ্জনের জীবনের প্রথম সঙ্কটবিন্দু। তবে শুধু প্রেম নয়, নীলাঞ্জন দে'র সঙ্কট দাঁড়াতে পারতো অন্য অনেক কিছু ঘিরে।

তিনি অর্থাৎ নীলাঞ্জন দে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সিলেবাসে শিক্ষিত বিংশ শতকের গোড়ার দিকের একজন আধুনিক বাঙ্গালী। পিতা পৃথ্বীশ দে মৃত। অথচ সে মৃত্যুও তাঁকে কোনো সঙ্কটের মুখে দাঁড় করায় নি। দূরদর্শী পিতামহ ঢাকায় টিকাটুলির অদূরেই চার বিঘে জমির বিশাল বাড়ির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন (বসু, রচনাসংগ্রহ-৯, নীলাঞ্জনের খাতা ২৭৬)[২] যা কাকাদের দেশে-বিদেশে থাকার কারণে এখন সংসারের একমাত্র সন্তান নীলাঞ্জন এবং তাঁর মায়ের জীবনকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও অন্তত মৌলিক চহিদাগত নিঃসঙ্কটতা প্রদান করেছে। সুতরাং বাঙ্গালী সমাজে বাবার মৃত্যুতে আশঙ্কিত সঙ্কটসমূহ নীলাঞ্জন দে'র জীবনে গভীর কোনো ছায়াপাত করে নি।

---

১ । হকারী অধ্যাপক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

২। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা* থেকে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, নবম খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই পৌষ ১৩৯৯* । পরবর্তী বন্ধনীবদ্ধ তথ্যসূত্রসমূহের (Parenthetical Reference) ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু *নী.খা.এবং সংশি-ষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর)*।

এছাড়া নীলাঞ্জন দে'র জীনকালের যে পর্বটির চিত্ররূপ এই উপন্যাস, ইতিহাসে সে এক গভীর সঙ্কটের সময়। নীলাঞ্জন দে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন ১৯৩৪ এর পূর্বে তবে এর নিকটবর্তী কোনো এক সময়ে।[১] বিশ্বের ইতিহাসে সে এক ঘোরতর সঙ্কটের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্প সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তীব্র বীভৎসতায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইম্প্রেশনিজমের টেকনিক সময়ের যন্ত্রণাকে ধারণ করার আর শক্তি রাখছে না (Guenther 37)। যুদ্ধ শেষে শান্তিপ্রিয় মানুষেরা বীভৎসতা থেকে মুক্তি পেতে যে অধীর আগ্রহে দিনাতিপাত করছিলো তারই প্রকাশ স্বরূপ উইমার রিপাবলিকের ১৯১৯-৩৩ সময়কালের মধ্যে বিশেষ করে চিত্রশিল্প জগতে শিল্পসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ধারা এক্সপ্রেশনিজম অনেকটা নির্জীব ও নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিলো। এক্সপ্রেশনিজমের তীব্র রঙের কম্পোজিশনে প্রকাশিত ত্রাস ও ভীতির পরিমাণ গণমানুষের অনুভূতির উপর অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছিলো। তখন সাধারণের অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাতেই যেন বিশের দশকেই জন্ম নিচ্ছিলো স্নিগ্ধ প্রশান্তির ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক ধারা (Guenther 43)। বিস্ময়কর যে, কাব্যপ্রেমী নীলাঞ্জন যিনি নিজের মুখে বলছেন সতেরো বছর বয়সে 'শরৎ চন্দ্রকে গিলে খেয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে ক্লুট হামসুন আর মাক্সিম গর্কীকে ধ'রে ফেলেছি, 'দি পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে' পড়া হয়ে গেছে' (নী. খা. ২৭৯), সেই নীলাঞ্জন দে'র মানস জগতে শিল্পজগতের বিশ্বব্যাপী এসব সঙ্কটেরও কোনো রেখাপাত আমরা উপন্যাসে লক্ষ্য করি না।

এই সময়ের ভারতবর্ষের চিত্র অধিকতর গভীর সঙ্কটের উদাহরণ। মন্টেগ-চেমসফোর্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯১৯ পাস হয়ে গেছে। অল্প ব্যবধানে পাস হয়ে গেছে কুখ্যাত রাউলাট আইন ১৯১৯ যার ফলশ্রুতিতে ঘটে গেছে অমৃতসরের জঘন্য তাণ্ডব। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ডাকে গণমানুষ এমন সাড়া দিতে শুরু করেছে যে 'জেলখানা হয়ে উঠেছে ভারতমাতার মুক্তিকামী জনতার তীর্থস্থান' (Mukherjee 417)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরকে পর্যন্ত অবাক করা ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র নীলাঞ্জন দে (নী. খা. ৩১৫) রেনেসাঁস থেকে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত যাঁর প্রত্যহ বিচরণ (নী. খা. ২৯১), সেই অসাধারণ নীলাঞ্জন অসাধারণ ও অস্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এই সকল সঙ্কট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তাঁর দীর্ঘ স্মৃতির খাতায় এসব নিয়ে একটি লাইনের দুশ্চিন্তাও নজরে পড়ে না।

বুদ্ধদেব বসু তঁর নামপুরুষ কথকের জবানিতে এর কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি যে নীলাঞ্জন দে কেন এই সকল দৃশ্যমান সঙ্কটগুলোকে গণনা-ই করছেন না, অথচ এত ধীমান ও এনলাইটেন্ড ব্যক্তিটি স্থূল সিনেমা কাহিনীতে সচরাচর যাকে বলা হয় ত্রিভুজ প্রেম তেমন একটি প্রেম কাহিনীর মধ্যে তাঁর জীবনের প্রাথমিক সঙ্কটটি অনুভব করছেন এবং পরক্ষণেই সে সঙ্কট দাঁড়িয়েছে অন্য এক বড় সমগ্রকে ঘিরে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজ সচেতনতার ঘাটতি বলেও অনুভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে নীলাঞ্জন দে'র কথকতায় তাঁর প্রেম পর্বের এবং তৎপরবর্তীতে জীবনের সমগ্রতায় অনুভূত সঙ্কটটিকে যে চিন্তন ও ঘটনাচিত্রের মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো বিশে-ষণ করলে খুব প্রকটভাবে অনুভূত হয় যে সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক এবং এমনকি প্রেমের মত ব্যক্তিক সঙ্কটের চেয়ে অনেক প্রকট এক দার্শনিক সঙ্কটের অভিব্যক্তি তাঁর সামগ্রিক জীবন। অস্তিত্ববাদী দর্শনে জীবনকে যেভাবে

[১] আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি এই যে নীলাঞ্জন দে নন্দিনীতে স্থাপিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ইন্টারভিউ কালে দেখছেন তাপসী দত্তের বি. এ. পাস ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (নী. খা. ২৪২)। অপরদিকে নীলাঞ্জন দে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র এবং তাপসী দত্ত যখন বরিশাল ছেড়ে তাঁদের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন একদিন নীলাঞ্জন দে তাপসীকে বলেছিলেন "তুমি তো আই. এ. পাশ করেছো, ভরতি হ'য়ে যাও না কেন ইউনিভার্সিটিতে?" (নী. খা. ৩১৮)। এর সাথে উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯২১ সালে। এই সব মিলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে নীলাঞ্জন দে'র বি. এ. পাশ তাপসী দত্তের ১৯৩৪ সালের বি. এ. পাসের পূর্বে এবং ১৯২১ সালের পরে।

সীমাহীন মরুভূমির মত ধুধু সঙ্কটের এক বিস্তার আকারে চিত্রিত করা হয়, জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রভূত বৈভব ও প্রাচুর্য নিয়েও, নীলাঞ্জন দে'র জীবন তেমন এক সঙ্কটের জীবন্ত প্রতিরূপ। সামগ্রিক জীবনটিই যেখানে এমন এক সঙ্কটের প্রতিলিপি সেখানে সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক অপর সকল সঙ্কট ও বিপত্তি গৌণ হতে বাধ্য। কামু'র Meursaultও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ কিংবা আরব-ফরাসী সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত হয় না, Hamletও ডেনমার্কের জনগণ কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবিত হওয়ার অবকাশ পায় না। এতে কামু কিংবা শেক্সপিয়রের বিরুদ্ধে যেমন সামাজিক দায়হীনতার অভিযোগ নেই, অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়নের চরিত্র হিসেবে নীলাঞ্জন দে'ও তেমনি লেখক বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে সামাজিক দায়হীনতার অভিযোগ প্রশমন করে। সাথে এটিও স্বাভাবিকভাবে লেখক বুদ্ধদেব বসুর জন্য একটি বড় কৃতিত্বের বিষয় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সচেতনভাবে সৃষ্ট একটি অস্তিত্ববাদী চরিত্রের প্রথম নির্মাণ হয়তো তাঁরই হাতে।

নীলাঞ্জন দে'কে অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়নের একটি সফল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্ববাদ নামক দর্শনের ধারাটির উপরে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি ভয়াবহ অদার্শনিক স্বভাব আছে। দর্শন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতার এক শাস্ত্র। সাম্প্রতিক কিছু দিন বাদ দিলে দর্শনের গোটা ইতিহাস হলো মোটের উপর এক যুক্তিবাদিতার (Reason) ইতিহাস। অথচ অস্তিত্ববাদী দর্শনের শেকড় আবেগ ও আকাঙ্খার মৃত্তিকায় প্রোথিত যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতার স্থান নেই কিংবা থাকলেও খুব গৌণ। সাধারণভাবে দার্শনিকরা যেখানে মানুষের সংজ্ঞা দেন 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী '(Rationa animal) হিসেবে সেখানে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মানুষের সংজ্ঞা দেন 'আবেগ ও আকাঙ্খাসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী' (Animal with Reason, Will and Emotion) হিসেবে (Raymond 2)। এই সংজ্ঞায় লক্ষ্যণীয় যে অস্তিত্ববাদীরা তাঁদের দার্শনিক প্রক্রিয়ায় বা অনুসন্ধিৎসায় বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন না, তবে তাঁরা আবেগ ও আকাঙ্খাকে গুরুত্বের সাথে যুক্তিবাদিতার পাশে স্থান দিচ্ছেন। অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন জীবনের যে অভিজ্ঞতাসমূহ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত নয় (Nonintellectual modes of experience) বরং হৃদয়বৃত্তির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও সমানভাবে দর্শনের ক্ষেত্রভুক্ত এবং দর্শনের দায়ভুক্ত। দর্শনের জটিল অন্ধিসন্ধিগুলোতে মস্তিষ্কের যেমন অধিকার, শরীর ও আত্মারও তেমন অধিকার (Unamuno 28)। মানস জগতের এই বিশাল রাজ্যকে শুধু কবিতা আর উপন্যাসের জন্য বরাদ্দ দিয়ে দিতে রাজী নন অস্তিত্ববাদীরা। তবে অস্তিত্ববাদীদের এই দাবীতে কবি সাহিত্যিকরা দখলি সত্ত্ব আপনাআপনি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন তা-ও তো স্বাভাবিক নয়। তাই অস্তিত্ববাদের জমিনে দুই পক্ষের দাবীর সমবিন্দুতে ঘটেছে দার্শনিক-সাহিত্যিকের এক মহামিলন। অস্তিত্ববাদের দার্শনিকদের তালিকায় তাই প্যাসকাল, কিয়ের্কেগার্দ, উনামুনো, হাইডেগার, নীটশে প্রমুখ দাশনিকের সাথেই রয়েছে সাহিত্য জগতের বিশাল বিশাল মহীরূহ। কামু, সার্ত্র, দস্তয়েভস্কি, দে বেভোয়ার প্রমুখের মত বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ববৃন্দ অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা দার্শনিকরূপেও সুবিদিত। বুদ্ধদেব বসুর কবি বা সাহিত্যিক চরিত্র নীলাঞ্জন দে মনোরাজ্যে বহন করেন এঁদেরই অনেকের অস্তিত্ববাদ বিষয়ক ভাবনা ও সঙ্কট যা নীলাঞ্জন দে'র যাপিত জীবন পরিক্রমায় এবং বিশেষ করে জীবনকে খতিয়ে দেখার উপসংহার পর্বে পৌনপুনিকভাবে প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়।

অস্তিত্ববাদী দর্শন কী এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ জীবনের কী কী সঙ্কটের কথা বলেন- এ প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সংবলিত উত্তর নেই। সার্ত্র অনেকটা খেদোক্তি আকারে একবার বলেছিলেন অস্তিত্ববাদ আজকাল এত হরেক রকম আপাত অসংলগ্ন বিষয়াদিকে বোঝায় যে এর দ্বারা (অস্তিত্ববাদ দ্বারা) মূলত

এখন আর কিছুই বোঝায় না (Sartre 15)। একই অস্তিত্ববাদ কখনো ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (কিয়ের্কেগার্দ), আবার কখনো ঈশ্বরের অনস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত (সার্ত্র কিংবা নীটশে)। হ্যাঁ ও না এর এমন অসমন্বিত যোগফল দর্শনের অন্য কোনো অঞ্চলে আর দেখা যায় না। এটি অস্বাভাবিক কেনো চিত্রও নয়, কেননা অস্তিত্ববাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এটি একটি মৌলিক ধারণা যে জীবনের সীমাহীন অভিজ্ঞতাগুলোকে কোনো সুষম পদ্ধতিগত বিন্যাসে উপস্থাপন সম্ভব নয় (cannot be neatly summarised into a system)। তারপরও বিশেষ করে দর্শনের অধ্যাপকগণ অস্তিত্ববাদের এত বিবিধ ও বিপরীতমুখী ভাবনাগুলোকে এক সুতায় গাঁথার অর্থাৎ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। Existentialism and the Philosophical Tradition গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক Diane Darsoum Raymond তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজন। তিনি এই সমন্বয়ে অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন কয়েকটি মৌলিক বিষয়ঃ Meaning, Anxiety or Suffering, Alienation, Freedom, Intersubjectivity and Authenticity (Raymond xi)। রেমন্ডের সমন্বয়ে ও আলোচনায় এই বিষয়গুলো তাদের ব্যক্ত্যর্থে ভিন্ন ভিন্ন হলেও অস্তিত্ববাদের কাঠামোতে তারা পরস্পর ও আন্তসংযুক্ত একটি সমগ্র। এই বিষয়গুলোর অধিকাংশই নীলাঞ্জন দে'র জীবন ও জীবনবোধের সঙ্কটকে ঘিরে আবর্তিত।

*নীলাঞ্জনের খাতা* উপন্যাসের মূলকাহিনী যখন নীলাঞ্জন দে নিজে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন তখন তাঁর যাপিত ও চলমান জীবন নিয়ে এক যন্ত্রণার পরিক্রমা চলছে। উক্ত যন্ত্রণা কোনো এক রৈখিক শারীরিক ব্যথাবোধ নয়। এর মধ্যে একীভূত আছে বহুমুখী ভাবনা ও বিষয়। জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে অর্জিত নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের দায় গ্রহণের যন্ত্রণা ইত্যাকার নানান প্রসঙ্গ। এসবই অস্তিত্ববাদের সাথে তাঁর যন্ত্রণার সাদৃশ্য উপস্থাপন করে।

অস্তিত্ববাদের এই যন্ত্রণা সম্পর্কে বলতে গেলে J. A. Cuddon কে স্মরণ করা খুব প্রাসঙ্গিক। অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যায় J. A. Cuddon তাঁর Penguin Dictionary of Literary Terms এ বেশ সহজ করে বলেছেন অস্তিত্ববাদ হচ্ছে Supine and passive existence থেকে Active existence এ পৌঁছার Consciousness অর্জন করতে গিয়ে এবং Meaningful existence এর চেষ্টা করতে গিয়ে অপরিহার্য ফলস্বরূপ অর্জিত Angst or Sufferings। এ কথা অবশ্য মৌলিকভাবে J. A. Cuddon এর নয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের অধিকাংশের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি রয়েছে এ ব্যাখ্যায়। দস্তয়েভস্কি বলেছেন যন্ত্রণাই সচেতনতার উৎস। কামু বলেছেন মানুষ হিসেবে জীবনের প্রথম যন্ত্রণাটাই অনুভূত হয় তখন যখন জীবনের সচেতন অনুভব থেকে প্রথম পশ্ন জাগে 'কেন এই বেঁচে থাকা'।

> Rising, streetcar, four hours in the office or the factory, meal, streetcar, four hours of work, meal, sleep, and Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday or according to the same rhythm – this path is followed most of the time. But one day the 'why' arises and everything (of existential pain) begins in that weariness tinged with amazement. (Camus 10)

এই কেন'র প্রসঙ্গে Raymond বলেন অস্তিত্ববাদ যেহেতু ধরে নেয় যে essence এর পূর্বেই existence (Existence precedes essence), সেহেতু অস্তিত্বের বাহকেরই দায় হয়ে দাঁড়ায় সেই

অস্তিত্বের অর্থ অন্বেষণ। কিন্তু অস্তিত্বের কোনো স্থির নিশ্চিত অর্থের সন্ধান সম্ভব হয় না এবং তখন মানুষের জন্য আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র অনুভূতি যা শুধু মানুষই অনুভব করতে পরে এবং যার নাম নৈরাশ্য তথা নৈরাশ্যের যন্ত্রণা (Raymond 9) ।

তবে উল্লেখ্য যে অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক Raymond: Existential theist, Existential nihilist and Existential revolter (39)। এঁরা সকলেই নিজ অস্তিত্বকে সকল শর্তের বাইরে রেখে স্বাধীন ও সচেতনভাবে Active existenceকে অনুভব করেন। এই অনুভব অন্তে Existential theist'গণ আত্মার মুক্তির মাঝে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পান ফলে Existential Sufferings তাঁদেরকে আক্রমণ করে না এবং অস্তিত্ববাদের এই আবশ্যিক অংশটির সাথে তাঁরা সম্পর্করহিত বলে অনেকে তাঁদেরকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে স্বীকারই করেন না। Existential nihilist'গণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা জীবনের কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য কিংবা অর্থ খুঁজে পান না। সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করাই তাঁদের পক্ষে নীতিগতভাবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের একমাত্র সুখ তাঁরা জীবনে কোনো সুখের মোহে বা আশায় ভোগেন না। Existential revolterদের অবস্থান মধ্যবর্তী। এঁরা জীবনের এবং অস্তিত্বের অর্থ সন্ধান করেন। উপলব্ধি করেন যে অস্তিত্বের স্থির সুনিশ্চিত অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তবে নিজ অস্তিত্বের শক্তি ও সামর্থ্যের বিশ্বাসে সিসিফাসের মত একটি বিদ্রোহী শক্তি এঁদের মাঝে জেগে ওঠে। অনুমিত হচ্ছে সিসিফাস জানেন যে তাঁর পাথর পাহাড়ের চূড়ায় কোনোদিন পৌঁছবে না, তারপরও অমিত শক্তিতে সেই চেষ্টাটাই তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছেন। জীবনের সুনিশ্চিত অর্থহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনার এইটুকু অর্জনই Existential revolterদের কাছে অস্তিত্বের অর্থ এবং জীবনের সুখ ও আনন্দ।

নীলাঞ্জন দে'র অস্তিত্ব ও জীবন নিয়ে এই সচেতন অনুভব তাঁর স্মৃতিকথা লেখাকালের। কামু কথিত 'কেন' প্রশ্নটি তখন তাঁর সবে জেগেছে এবং তিনি তাঁর যাপিত ও চলমান জীবনের অর্থের অনুসন্ধান কেবল শুরু করেছেন। তিনি অনুভব করতে শুরু করেছেন "কত দেরীতে জীবনকে মূল্য দিতে শিখি আমরা, যৌবনের স্পর্ধায় কত অবহেলা করি জগৎকে, কত বছর কেটে যায় শুধু এই কথাটি বুঝতে যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের চেয়ে কিছুই বড় নয়- কিছু না, কিছুই না!" (নী. খা. ২৬৪)। যে সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর এই অনুভব সে সময়কে অবশ্য তিনি অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত ফিকশনসমূহ যাতে অস্তিত্ববাদের বক্তব্য ধৃত আছে সেসব উপন্যাসে অবশ্য অতীতের উপর দাঁড়িয়ে জীবন মূল্যায়নের এমন উদাহরণ খুব গোচরীভুত হয় না। বুদ্ধদেব হয়তো এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম স্থাপন করেছেন। অবশ্য সেই ব্যতিক্রম আমাদের আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমরা দেখবো জীবনের স্বাধীন ও শর্তহীন অস্তিত্বকে এভাবে সবার উপরে স্থান দেয়ার পরে নীলাঞ্জন দে যখন এর চূড়ান্ত অর্থ খুঁজতে গেলেন তখন সুনিশ্চিত অর্থহীনতার উপলব্ধিতে তাঁর নৈরাশ্য ও যন্ত্রণার চিত্রটি কী দাঁড়ালো।

এ ক্ষেত্রে নীলাঞ্জন দে'র প্রতীতিতে Raymond কথিত তিন শ্রেণীর অস্তিত্ববাদীর চারিত্র্যই লক্ষ্য করা যায়। নীলাঞ্জন দে অনুভব করেন জীবনের বর্তমানটুকু ঘিরে সকল যন্ত্রণারা আবর্তিত হয়। জীবনের বাইরে জড়ের, প্রগতির, চেতনার কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। উপলব্ধি করেন "প্রগতি বলে কিছু নেই, সব ফিরে ফিরে আসে, অতীতকে আমরা কিছুতেই ছাড়াতে পারি না" (নী. খা. ২৪৫)। এ উপলব্ধিতে নীলাঞ্জন দে Existential nihilist এর চারিত্র্য বহন করেন। এমনই অনুভব লক্ষিত হয় যখন যাযাবরের মত দেশ থেকে দেশে ফেরা নোঙরহীন জীবন নিয়ে অনুশোচনা করে বলেন "কোনো নতুন

শহরে, নতুন দেশে পৌঁচচ্ছি, এই বোধটাই আশ্চর্য, পৌঁছলে পর নতুন কিছু নেই। পথ আর ভ্রমনের গতি: সেটাই সব। আসল কথা, কোথাও কোনো শেকড় নেই আমার; ভেসে ভেসেই জীবন কেটে যাবে " (নী. খা. ২৪৬)। অর্থের অন্বেষণে ক্রমাগত এই অর্থহীনতার সন্ধান দিশেহারা করে তোলে তাঁকে। সচেতন অস্তিত্বের বাইরের স্বপ্নের মাঝের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-অনুভূতিকেও জীবনের অর্থ হিসেবে আঁকড়ে ধরতে তখন আকাঙ্খা জাগে। প্রশ্ন জাগে-

> কেন স্বপ্নেরা সাধারণত এত ভীতু, কেন ছেঁড়াখোঁড়া ভিখিরির মতো বা আধপেটা বেশ্যাদের মতো অন্ধকার গলির মোড়ে মোড়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে- পুলিশের বুটের শব্দে কিলবিল ক'রে ঢুকে পড়ে যে যার বিবরে, এদিকে রাজপথে নিশেন উড়িয়ে চলে মাসের শেষে মাইনে, পটল কিনতে গিয়ে দরদস্তুর ক'রে তিন পয়সা বাঁচানো (জীবন) ? কেন তারা সাহস ক'রে চুলের ঝুটি ধ'রে টেনে নেয় না আমাদের, যেমন আমাকে নিয়েছিলো সেই রাত্রে, প্যাসিফিক-পেরনো এরোপ্লেনের তন্দ্রার মধ্যে? কী আশ্চর্যই না হ'তো যদি ঐরকম ছবি দিয়ে-দিয়ে সচেতনভাবেও ভাবতে পারতুম আমরা, ভাবতে পারতুম রক্ত দিয়ে, বিনা চেষ্টায়, আমাদের অস্থিমজ্জার পরতে-পরতে। (নী. খা. ২৫৪)

এই চিত্রে দৃশ্যমান Existential nihilist নীলাঞ্জন দে'র পক্ষে অস্থিমজ্জার পরতে-পরতে জীবনের এমন অর্থের এবং এমন আনন্দের অনুভব সচেতন জীবনের অবস্থানে থেকে সম্ভব হয় না। তাঁর পক্ষে বরং সম্ভব হয় অধিকতর বেদনার অনুভব- 'খারাপ যখন লাগছেই তখন আরো খরাপ লাগুক, কত খারাপ লাগতে পারে, দেখি!' (নী. খা. ৩১৭)।

নীলাঞ্জন দে'র জীবনে সক্রিয় অস্তিত্ববোধের এই স্মৃতিকথা লেখাকালীন পর্বের পূর্বে আরেকটি পর্ব গত হয়েছে যখন Existential theistদের সাথে তাঁর জীবনবোধের সাদৃশ্য ছিল। সে পর্বে দেখা যায় তিনি অস্তিত্বের অর্থ খুঁজছেন একটি পরম শর্তহীন অতীন্দ্রিয়তায় (Absolute Unconditional Transcendence)। তাঁর এই অন্বেষণের সাথে সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (Soren Kierkegard), পল টিলিশ (Paul Tillich) কিংবা কার্ল ইয়াসপার্সের (Karl Jaspers) দার্শনিক ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। অস্তিত্বের যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তি এবং অস্তিত্বের বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতে এর সার্থকতার আকর রূপে তিনি কখনো দাঁড় করাতে প্রয়াস পেয়েছেন মৃত্যুকে আবার কখনো বা ভালোবাসাকে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শরীরী অস্তিত্বের বাইরে অবস্থিত এক সার্থকতায় পৌঁছার আকাঙ্খায় তিনি যথেষ্ট আবেগের সাথে উচ্চারণ করছেন-

> মৃত্যুর যদি এটুকু দাবী না থাকে জীবনের উপর যে একবার তার সান্নিধ্যে এলে, অন্তত কিছুদিনের জন্য, চেতনার কোনো গভীরতর আহ্বান আমরা শুনতে পাবো, কোনো পাতালের কলরোল, কোনো স্তবগানের প্রতিধ্বনি- মৃত্যুর যদি এটুকুও দাবী না থাকে আমাদের উপর তাহ'লে তো মানুষের আর পশুর জীবনে তফাৎ থাকে না। (নী. খা. ২৬৪)

জীবনের বিরল আনন্দের এক মুহূর্তে মৃত্যুকে তাই তাঁর খুব কাছে মনে হয়। 'এখন ম'রে গেলেই তো হয়,' কথাটা আমার মগজের মধ্যে খেলে গেলো, 'মরবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর কখন পাবো!' (নী. খা. ৩৩৭)।

তবে পরক্ষণেই সাময়িক বুদ্বুদের মত একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ববাদের সাথে আপাত সঙ্গতিহীন জীবনের অন্তস্থিত প্রেম রূপক একটি বিষয়কে জীবনের অর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান প্রেম-নিয়ে-কোনোদিন-না-ভাবা প্রেমিক নীলাঞ্জন দে। তাপসী দত্তের বাহুবন্ধনে জীবনের একটিবারের

আলিঙ্গনে এমন একটি পুরুষ অস্তিত্ব জেগে উঠেছিল নীলাঞ্জন দে'র জীবনে। প্রেমের মধ্যে জীবনের সার্থকতা প্রতিষ্ঠার পুরুষটি তাৎক্ষণিকভাবেই তাঁর জন্য জীবনের দৈনন্দিনতায় চমৎকার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিল-

> কিন্তু না- বাঁচবার আদেশ হয়েছে আমার উপর, আজ থেকে নতুন জীবন আরম্ভ আমার, আজ থেকে যতদিন বাঁচবো প্রতিটি দিন ঠিক এই রকমই হবে, কেননা সে আমার সঙ্গে থাকবে- সে! এখনো জ্বালা করছে আমার মুখ, তাপসী যেখানে চড় মেরেছিলো সেখানে আর হাত রাখিনি তার পরে- ঠিক অমনি থাক, কোনো এক অজানা জন্ম নিচ্ছে সেই আঘাতটিকে ঘিরে ঘিরে, তাকে আমি বিরক্ত করবো না। তার কোমল চুল আমার মুখের উপর, তার গ্রীবার গন্ধ আমার মুখের উপর- দ্যাখো, কেমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছি আমি, আমার গা থেকে যেন তারা ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে। (নী. খা. ৩৩৭)

প্রেমের মাঝে জীবনের অর্থ প্রতিষ্ঠার এই শেষোক্ত প্রয়াস অবশ্য দর্শনের শর্ত পূরণ করে না, যেহেতু সমগ্রের অর্থ অংশ ধারণ করতে পারে না। তবে এই অসঙ্গতি নীলাঞ্জন দে'কে অস্তিত্ববাদী চরিত্র থেকে খুব একটা দূরে সরায় না কারণ তাঁর এই প্রয়াস একেবারে বুদ্বুদের মতই সাময়িক এবং তাৎক্ষণিক। এই একমাত্র উচ্চারণের পূর্বে বা পরে কখনোই অস্তিত্বের বেদনাবিস্মৃত এমন লক্ষ্যমুখী সহজ উল্লাসের উচ্চারণ তাঁর জীবনে আর নেই। এই সাময়িক বিচ্যুতির বাইরে বরং Existential revolter হিসেবে সারাটি জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করার যে স্থায়ী সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, যে revolt এর শক্তিতে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজেকে সমর্পনের পরিবর্তে সিসিফাসের পাথরটির মত জীবনকে বয়ে বেড়াচ্ছেন এবং যার বলে তিনি আজ সারা পৃথিবী জুড়ে, এশিয়া ইউরোপ আর আমেরিকার মাটিতে আর আকাশে অস্তিত্বের এক স্থায়ী যন্ত্রণা যাপন করে যাচ্ছেন, সেই সিদ্ধান্তের স্বাধীন নির্বাচক নীলাঞ্জন দে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের বক্তব্য ও মতামতের নিরিখেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অস্তিত্ববাদী চরিত্র।

উপরের বাক্যটিতে যে বিশেষ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হলো 'স্বাধীন' ও 'নির্বাচক' এই শব্দদ্বয়কে প্রফেসর Raymondও অস্তিত্ববাদের ধারণার কেন্দ্রে রেখেছেন যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। উক্ত শব্দদ্বয় নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যেও নীলাঞ্জন দে অস্তিত্ববাদের সঙ্কট বিমূর্তায়নের চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার যোগ্য। ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকেও নীলাঞ্জন দে নিজেকে স্বাধীন জ্ঞান করেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন-

> 'আমাদের বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে- অসংখ্য দুঃখ আর অমঙ্গলের আমরা অধীন, কিন্তু আমাদের এই ক্ষণিক অস্তিত্বের বাইরে কোনো-এক অনন্ত, চিরন্তন, সর্বক্ষম ও মঙ্গলময় সত্তার এ পর্যন্ত মানুষ শুধু কল্পনাই করেছে, এই জগতের মধ্যে কোনো প্রমাণ পায় নি। হয় ভগবান নেই, নয় তিনি সর্বক্ষম নন, কিংবা সর্বক্ষম হলেও মঙ্গলময় নন- । (নী. খা. ২৯২)

এই অক্ষম ভগবানের অধীন তিনি নিজেকে মনে করবেন না এটাই স্বাভাবিক। ভগবান থাকলেও তাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি রাখেন বলে মনে করেন। মিলির জায়গায় ক্রমে তিনি তাপসীকে স্থান দিয়েছেন। এ ঘটনাও তাঁর স্বাধীন নির্বাচন। এ নিয়ে তিনি অন্য কাউকে দায় দেন নি। সর্বোপরি একটি নোঙরহীন জীবনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার চরম সিদ্ধান্তটিও তাঁরই স্বাধীন নির্বাচন। এই সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা সুতরাং বৈধ এবং তারও চেয়ে বরং সমালোচকদের ঔচিত্যের দায়যুক্ত যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়নে প্রথম কিংবা অন্যতম আদি পর্বের চরিত্র বুদ্ধদেব বসুর *নীলাঞ্জনের খাতা* শীর্ষক উপন্যাসের নাম চরিত্র নীলাঞ্জন দে।

**উদ্ধৃত গ্রন্থমালা**


বসু, বুদ্ধদেব। নীলাঞ্জনের খাতা। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, নবম খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই পৌষ ১৩৯৯। পৃষ্ঠা ২৩৯ - ৩৫৯।

Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Trans. Justin O'Brien. New York: Vintage Books, 1955.

Guenther, Irene. "Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimer Republic." Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris. Durham & London: Duke University Press, 2003. 33-73.

Mukherjee, L. A Study of English History. Calcutta: Mondal Brothers & Co. (Private) Ltd., 28th Edition.

Raymond, Diane Darsoum. Existentialism and the Philosophical Tradition. New Jersey: Prentice Hall, 1991.

Sartre, Jean-Paul. Existentialism. Trans. Bernard Frechtman. New York: Philosophical Library, 1497.

Unamuno, Miguel de. The Tragic Sense of LIfe. Trans.J. E. Crawford Flitch. New York: Dover Publications, 1954.